॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ক॰ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে গণচেতনার আভাস

বর্ত্তমানকালে মার্কসবাদের প্রভাবে গণসাহিত্য উজ্জ্বল। অতীতে তার সম্ভাব ঘটেনি। গণচেতনার প্রাবল্যে আজকের সাহিত্য দীপ্ত। চারপাশের পরিচিত সমাজ যে সত্য নিয়ে আবির্ভূত, সেকালের সমাজের কাছে তা প্রত্যাশা করা যায়না। সে যুগের রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের রাজ্যপাট বদলে গিয়ে তার জায়গায় উপস্থিত আজকের জন-গণ-সরকার। একটা বিরাট ব্যবধান স্বাভাবিক ভাবেই দুই কালের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করবে। প্রাচীন মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। সামন্তবাদের কালসীমা অতিক্রান্ত হবার পর আধুনিক কালের আরম্ভ, ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের আধিপত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা লাভের পূর্বপর্যন্ত। পালবংশ থেকে ব্রিটিশ শক্তির আগমনের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত সামন্তবাদ। আরবীয় ও পারসিক ব্যবসায়ীদের হাতেই সামুদ্রিক ব্যবসা দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দী অবধি স্বচ্ছল ছিল। ফলে বাংলার ব্যবসায়িক ভাগ্য মন্দা যায়। কিন্তু সেনবংশের শাসনকালে কৃষিনির্ভর বাংলা, ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রেও স্বয়ম্ভর হয়ে উঠে।

মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্য জুড়ে গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনের বিচিত্ররূপ প্রতিফলিত। মূলতঃ এই সমাজ ব্যবস্থার ধারা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হিন্দু প্রাধান্য, বক্তিয়ার খিল্‌জির লোলুপতার গ্রাসে লুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে বর্গীদের ক্রমাগত অমানুষিক লুণ্ঠন বাংলার শস্য-ভাণ্ডার শূন্য করে দেয়। তবু মনে হয় মৌল পরিবর্ত্তন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বহুধাবিভক্ত করতে পারেনি। গ্রামজীবন তাই বাংলাসাহিত্যের ধারক, বাহক এবং রূপকার।

বৌদ্ধ গান ও দোহাকে কেন্দ্র করেই প্রথম দেশজভাষায় বাংলা কবিতার আত্মপ্রকাশ। প্রাথমিক প্রচেষ্টায় পদগুলো মার্জ্জিত ও নির্ভুল না হলেও আমরা নিঃসন্দেহে মুগ্ধ ও চমৎকৃত না হয়ে পারিনা। কারণ যখন লক্ষ্যকরি চর্যাপদের কবিরা জীবনের অসঙ্গতি, বিপর্যয় এবং দুঃখ-জ্বালার স্বরূপকে কী নিপুণ কৌশলে রূপকের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের চর্যাগানে এবং দোহাকোষে। ধর্মের ছাউনি-

তলে মানুষের যাতায়াত। মনুষ্য সংসারে আনন্দ সুখের পাশাপাশি নিরানন্দ স্পর্শকাতর প্রাণগুলো সাহিত্যাংশে অবিকৃতভাবে চিত্রিত হয়ে আছে। চর্যার গানগুলিতে ভোগবর্জনের ডাক। তারই পাশে একই দেশে-কালে ভোগবিলাসের নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন রাজবন্দিত কবি জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধনাচার্য তাঁদের গীতগোবিন্দে, পবনদূতে, আর্যাসপ্তশতীতে। সাধারণ মানুষের কাব্যচর্চার সংবাদ চর্যাপদ। তত্ত্বের গুমোট অন্ধকারকে বোধগম্যতার সীমানায় আনার জন্য অথবা জীবনের সহজ বোধগম্য ব্যাপারকে গুহাহিত করার জন্য রূপক সংগৃহীত হয়, বস্তুজগত থেকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। জনগনের অনভিজাত ব্যবহারিক ভাষার আশ্রয়ে লিখিত চর্যাগীতি আজও অতীত স্মৃতিকে নির্বিঘ্নে বহন করে চলেছে।

চর্যার ভোগদ্রোহ বঞ্চনাজাত বলেই রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তার কঠোর সমালোচনা। মধ্যযুগীয় ভক্তি সাধনায় সহজিয়া ভাব-চর্চার মিল চর্যার কোথাও কোথাও নজরে পড়লেও ভাবধর্মে দূরত্ব অনেকখানি। অবশ্য উপনিষদের সঙ্গে ভক্তি সাধনার সাধর্ম্য রয়েছে যা চর্যায় অনুপস্থিত। উপনিষদে হৃদয়ের সাধনা আর চর্যাপদে দেহের সাধনা। হেঁয়ালি-ভেল্‌কি জাতীয় পদ-ছত্র উভয়াংশে থাকা সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত আচরিত সত্যের রূপ-পার্থক্য ভিন্ন চিত্রে প্রতিফলিত। মানসিক উপভোগ যোগী-জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে। সেই আলোড়িত গৃহজীবনের স্পর্শে সঞ্জাত চিত্রবোধই চর্যার সাহিত্যাংশ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সরহের ঊনচল্লিশ সংখ্যক পদটি,

"অমি আ আচ্ছহ বিস গিলেসি রে চি অপরবস অপা
ঘারেঁ পারেঁ কা বুঝ্‌ঝিলে ম রে খাইব মই ডুঠাকুণ্ডরী
সরহ ভণন্তি বর সূণ গোহালী বিমো ডুঠ্য বলন্দেঁ
একেঁলে জগ নাসি অ রে বিহরহুঁ স্বচ্ছন্দেঁ ॥" ১(চর্যা-৩৯)

(বাংলা ভাবানুবাদঃ চিত্তনির্ভরশীল আত্মাকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেন, অমৃত ফেলে বিষগ্রহণের অর্থ কি? গৃহবাসী হয়েও কি করে অবিশ্বাস জন্মালো যে কবি আত্মীয় বিমুখ ব্যক্তি! সুতরাং কবির ধারনা দুষ্ট'

বলদের চেয়ে শূন্য গোয়ালই শ্রেয়। একার দ্বারা জগৎ মিথ্যা হতে বসেছে, অতএব খেয়াল খুশীতে চলাই ভাল।)

বর্তমান যুগলক্ষণের ভিতর সেইভাব লক্ষ্য করা যায়। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'বেদিনী' কবিতায় "ওঠ্ রে বেদিনী, মোট তুলে নিয়ে বেদিয়ার হ'ত ধর।" পদারম্ভে ত্যাগের মহিমা, বিরাট অন্তরের পরিচয়। আর পদান্তে নবোত্তমের আশ্বাস পথ চলার ক্ষেত্রে প্রত্যয় যোগাচ্ছে।

ধর্মকে আশ্রয় করে সব দেশে সাহিত্যের আবির্ভাব। চর্যাপদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাকৃত অবহট্ট ও অপভ্রংশের খাত বেয়ে পুরাতন ভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃতের গাম্ভীর্য এড়িয়েই সহজ সরল বাংলায় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই লৌকিক ভাষাই পদগীতি সৃষ্টির পুরোপুরি সহায়ক। হাজার বছরের পুরনো এই ইতিহাসে দৈনন্দিন জীবনের যে পরিচয় বিধৃত, তাতে অসঙ্গতির দানা-বাঁধা রূপ ফুটে উঠেছে। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জীবনের নানাবিধ সংবাদ জানার সুযোগ আছে এই হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধগান ও দোহার পুথির মধ্যে।

আমরা জানি চর্যাপদ রচনার ক্ষেত্রে অবশ্য একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল। তা যোগসাধনের ইঙ্গিতবাহক। তবু নির্বাণরূপ পরম সুখকে আত্মস্থ করার প্রয়াস জুড়ে ধর্মসাধক চর্যাপদকারদের কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অধ্যাত্মচেতনার রাজ্যেও পরিচিত জগতের প্রতিফলন অব্যাহত। এই সাধন তত্ত্বের মধ্যে ভুসুকুর ঊনপঞ্চাশ সংখ্যক পদটি ঃ

"বাজ-ণাব-পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।
আজি ভুসু (কু) বঙ্গালী ভইলী
ণি-অ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী।

১। শ্রী সুকুমার সেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। পৃঃ ৭২, ৫ম সংস্করণ, ১৯৭০
১ম খণ্ড পূর্বার্ধ প্রকাশক- ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স ৮, সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট- কলিঃ ৯

সোণ রূ অ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
নি অ পরিবারে মহানেহে থাকিউ।
চউ- কোড়ি ভণ্ডার মোর লই আ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ২ (চর্যা- ৪৯ নং)

বাংলা ভাবানুবাদ ঃ বজ্র-নৌবাহিনী পদ্মাবক্ষে। ডাকাতের নির্মমতার মধ্য দিয়ে দেশ লুণ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী ভুসুকের স্ত্রী চণ্ডাল কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সোনা-রূপ অবশিষ্ট না থাকায় প্রেমানন্দে দিনাতিপাত করতে কবি বাধ্য হলেন।কারন ঁতার চার কোটি অর্থহানি যখন হয়েছে, তখন ঁবাচা মরা সমান কথা।

তৎকালীন সমাজ ধর্ম ও তার নিজস্ব গ্রামীন জীবণের বিশিষ্ট তথ্য- সম্ভার নিয়ে চর্যার উপস্থিতি। একান্নটি গীতে সাধারণ সংখ্যক নরনারীর প্রেম- প্রীতিময় পরিবেশে যে চিত্র পাওয়া যায় তা সাম্প্রতিক কালের কথা স্মরণ করায়। ঢেণ্ডনপাদের তেত্রিশ সংখ্যক পদটি ঃ

" টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত ঁনাহি নিতি আবেশী।' ১ (চর্যা ৩৩নং)

(বাংলা ভাবানুবাদ ঃ প্রতিবেশী শূন্য বস্তিতে (টালত) কবির ঘর। এরূপ দরিদ্র সংসারে অন্নাভাব স্বাভাবিক। হাঁড়িতে ভাত না থাকলেও নিত্য অতিথি আগমনের বিরাম নেই।)

কবিজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আজকের চোখেও একই অবিকৃত চিত্রের অবতারণা করেছে। পুরনো কালের কথা নতুনের কণ্ঠে এক অর্থেই উচ্চারিত। কাহ্নপাদের অষ্টাদশ সংখ্যক পদে- 'অন্ত্যজ ডোম্বী' চর্যার উদাহরণ ঃ

" তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ
কাজণ কারণ সসহর টালিউ।
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই
বিদুজণ- লোঅ তোরেঁ কণ্ঠন মেলঈ।
কাহ্নে গাইউ কাম চণ্ডালী

১। শ্রী সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ১৬ ৫ম সংস্করণ ১৯৭০. ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ

ডোম্বিত আগলি নাহি ছিণালী ।। ১ (চর্যা- ১৮ নং)

(বাংলাভাবানুবাদঃ সবকিছুর অনিষ্টের মূলে ডোমনীকে দায়ী করা হয়েছে। কারণ অর্থহীন খেয়ালে শশধরকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু অনেকের দৃষ্টিতে সে খারাপ অথচ গুণীদের কণ্ঠহার সে। কবির বিশ্বাস কামচণ্ডালীই সব থেকে বেশী নষ্টা।)

মোহাবিষ্ট ও সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ গণতান্ত্রিক জীবনের মূল্য হ্রাস করে। ঔপনিবেশিক মানসিকতা পুরনো দিনে ছিলনা সত্য, তবু, সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতার অভাব ছিল না। মানব সমাজে ধরণ-ধারণ গুলির পরিবর্তনের কথা পরবর্তীকালের প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব ঘটে মার্ক্সের মতবাদের মধ্য দিয়ে। সেইদিনের নাগাল হাতের বাইরে থাকা সত্বেও সেই প্রতিবাদী মানসিকতার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ঢেণ্ডনের পদে (পূর্বোক্ত)

(জো সো বুধী সোই নিবুধী
জো সো চোর সেই তুবাধী।) ১। চর্যা—৩৩নং)

(বাংলাভাবানুবাদঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নির্বোধদের পর্যায়ভুক্ত
এবং চোরেরাই এখন সাধুর আসনে।)

এই প্রাচীন চর্যাগীতি সমাজ-জীবনে চিরকালের অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রেরণা যোগায়। এর সাহিত্য মূল্য শুধু তত্ত্বে আচ্ছন্ন থাকেনি, অন্তর জুড়ে উৎপীড়িত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা সহানুভূতিতে রূপক চিত্র হয়ে উঠেছে। তারপর এল 'রামানন্দের প্রবর্তিত মহাযুগ'। ২

রামানন্দ বাহ্য আচার ছেড়ে ব্যবহারিক মুখের ভাষায় সমদৃষ্টির পরিচয় দেন। তাঁর দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীর ছিলেন (মুসলমান জোলা)। সেই ভক্তির স্রোতোধারা দ্রাবিড় দেশ থেকে রামানন্দ বয়ে আনলেন উত্তর ভারতে। সেই ধারার বিস্তার ঘটে কবীরের দ্বারা। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের প্রয়াস কবীরের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়

১। শ্রী সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৭৬, ৫ম সংস্করণ, ১৯৭০ ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ

২। ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি -পৃঃ ৬২, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১ম প্রকাশ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-কলিকাতা

"জৌর খুদাই মসীত বশত হৈঁওর মূলিক কিসকেরা
তীরথ মূরতি রাম নিবাসা দুহুঁমৈ কিনহুঁন হেরা ॥
পূরীব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মূকামা।
দিল হা খোজি দীল দিল ভীতরি ইঁহা রাম রহিনানা ॥ ১
(—কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিনী সভা পৃঃ ১৭৬)

চিরকাল ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় মানুষ অধীর। প্রাচীনকালের সমদৃষ্টির ভাবনাও এই পথেই রূপ নেয়। পরবর্তীকালে যা রাশিয়ায় সাম্যবাদের মধ্যে প্রচার লাভ করে।

বৈষ্ণবীয় পদাবলীর যুগে মঙ্গলকাব্যের প্রাধান্য। মঙ্গলকাব্যগুলির কোথাও কোথাও গণজীবনের রূপ প্রকাশের একটা সূক্ষ্ম প্রয়াস রয়েছে। ধর্মীয় সংস্কারের চাপে লৌকিক জীবন ভাবনার মর্যাদা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। চণ্ডী মনসা, ধর্ম প্রভৃতি দেবদেবীর অলৌকিক কার্যকলাপ কাব্য দেহ বেষ্টন করে থাকলেও এর অন্তর্মূল্যে রয়েছে অনবদ্য মানবিক আবেদন। মানুষের ভক্তি দিয়েই এঁদের অলৌকিক মাহাত্ম্য স্বীকৃত। সমাজের নিম্নবর্ণের জনগণের মনে ভক্তি এবং ভীতিরকারণে গ্রামীন সর্পদেবী মনসা, গোধারূপী চণ্ডী এবং গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুরের আধিপত্য বিস্তৃত।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা কঠোর ও কোমলের সমন্বয়ে কল্পিত। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে নিষ্ঠুরতার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এই বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এখানে সুখে দুঃখে আঁকা ঘটনাবলী সরাসরি সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলিত রূপ। অলৌকিক তথ্যের ভিড় থেকেও আমরা ফুল্লরা খুল্লনা, দুর্বলা, লহনা, ধূর্ত ভাঁড়ুদত্ত, ঠক ব্যবসায়ী মুরারি শীলকে দেখতে ভুল করি না। বোধ করি এরাই আধুনিককালের গল্প উপন্যাসের চরিত্রের মতো বেশী চিত্তাকর্ষক। চণ্ডীমঙ্গল রচিয়তা কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর বাস্তবানুভূতির প্রতিফলন তাঁর আখ্যান কাব্য জুড়ে। চিরকালের বিচারে সাধারণ মানুষ যে নিষ্পেষিত এবং উপেক্ষিত, সেই সমাজ-ছায়া আদর্শ নিষ্ঠ কবি সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে,

"উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক
নেউগি চৌধুরী নহি না করি তালুক।"

১। ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি -পৃঃ ৬২, , ১ম প্রকাশ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৫০। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-কলিকাতা।

পশুগণের গোহারির এই পুরো অংশটাই আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে গণজীবনের অস্ফুট প্রতিবাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। তৎকালীন সমাজের লৌকিক দুঃখকে নানা শ্রেণীর মানুষের প্রতীকরূপে নাট্য-দৃশ্যে পশুচিত্রের অবতারনা একঅভূতপূর্ব রূপক নাট্য-কর্মের পরিচয়।

পাঠান সুলতানদের গড়া নগরের চাক্ষুস স্মৃতি থেকে মুকুন্দ গুজরাটে নগর পত্তন পরিচ্ছেদ লেখেন। বর্ণস্তরিত সমাজ-ভাবনা অতিক্রম করার সাধ্য মধ্যযুগের দেবভক্ত বামুন পণ্ডিত ঘরের মানুষ মুকুন্দের থাকার কথা নয়। তবু এই শ্রেণী-চেতনা সত্ত্বেও গোটা সমাজের জীবনকে তার বহু রকমের বৈচিত্র্যের ভিতর পরিপূর্ণভাবে ধারনা করার জীবন সচেতনতা মুকুন্দ কবির ছিল। এই জীবনসচেতনতাই ব্যক্তির ক্ষেত্রে গণবোধ উদ্রিক্ত করার কারণ।

মনসামঙ্গলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নানা সম্প্রদায় ও ক্ষেত্রের মানুষের উপর দেবীর আপাত-অকারণ পীড়ন পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে অসন্তোষ ও ক্ষোভের আড়াল থেকে দেশ জোড়া প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়াকে ঘনীভূত করে তুলেছে। হয়ত সেই প্রতিবাদের একঘন মূর্তি চাঁদসদাগর। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে তা জানা যায়। এই প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হলে বিক্ষোভের ভিতর দিয়ে কর্মসূচী প্রস্তুতির পথে গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়ে ওঠার কথা। এ কাব্যধারায় জীবন ততটা এগোতে পারেনি। কেননা অত্যাচারের বিষয়টাও যে ধর্ম। মধ্যযুগের সমাজ-মানস, স্বর্গ-নরক অদৃষ্ট-কর্মফলের নামে দেবতাকে এপর্যন্ত সহ্য করেছে। তাই একাব্যে কর্মসূচীবদ্ধ গণবিক্ষোভ দেখা দেয়নি।

মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে কালুডোমের মতো সাধারণ মানুষদের অতি সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা গণজীবন থেকে গণজীবনের বাস্তবতাটুকু কত অনায়াসে আলাদা করে দিয়েছে। স্বর্গে যাওয়া ব্যাপারটা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের নামজাদা - নারীপুরুষদের পক্ষে অনেকটা বাপেরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার মতো ছিল। লাউসেন আর তার চার রানী সেইভাবে স্বর্গে যাবার কালে কালুডোমকেও সঙ্গে নিতে চাইলে। কিন্তু কালু তখন বেঁকে বসেছে,—

"কালু কয় মহারাজা মনে অবিসার।
জিউ গেলে না ছাড়িব জেতের ব্যবহার॥
স্বর্গ গেলে সভ্য যদি মদ্য মাংস পাই।
সংসার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই॥
সেন কন সুরা মাংস স্বর্গে নাহি পাবে।
দরশন করিবে দেবাদিদেব দেবে॥
কালু কয় দেব দেবে মোর কিবা কাজ।
মদ্য মাংস না পেলে মাথায় পড়ে বাজ।"

কালু ডোমের ঐ মানসিকতার প্রতিধ্বনি পৃথিবীর অন্য অংশের লোকজীবনের মধ্যেও দেখা যায়,—

"The story is told of a jesuit priest who failed to convert a group of Eskimos to christianity because he could not honestly promise them that there were seals in heaven. Choirs of white—robed angels singing eternally in praise of God scarcely made up in the minds of these practical men for the absence of the seal, the means of their subsistence." 1

কালুডোমের মতো সাধারণ মানুষের কাছে সংসারই সারাৎসার, তা 'অসার' নয়। দেবতায় তাদের মতো মানুষের কোনো লাভ নেই। রক্ত মাংসের জীবন আর তার ভোগটুকুকেই এরা চেনে, বিশ্বাস করে। নিছক সংসারের কাছে চাওয়া-পাওয়ার ঐ মধ্যযুগীয় নিরীহ ইচ্ছেটা যখন থেকে সংঘবদ্ধভাবে দাবী আদায়ের একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে সচেতন হয়ে উঠলো, তখন থেকে [illegible] অদৃষ্টবাদিতার আর সহিষ্ণুতার মধ্য-যুগ কেটে গিয়ে আধুনিক যুগের আরম্ভ। লোকজীবন পেরিয়ে গণ-জীবন। লখ্যা ডোমনী কালু ডোমেরা তখনই লোকজীবনের গুটি কেটে গণজীবনের ময়দানে জমায়েৎ হয়।

মঙ্গলকাব্যের পাশে পাশে লোক-সঙ্গীতের প্রতিপত্তি-যুগের আরম্ভ। এই ধারার মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় [illegible] ময়মনসিংহ

1. Howard selsam, meterialism and Idealism (Essay) in what is philosophy (Book).

গীতিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রথা-জীবনের বাইরে সংস্কারমুক্ত জীবন-ভোগের দাবী অনেকটা গণচেতনার নিকট গোত্রের। এই লোকসঙ্গীতের যুগে নাগরিক সাহিত্য রচয়িতা ভারতচন্দ্রের কথা আসে। তিনি নবযুগের আগমনের পূর্বাহ্নের কবি। মানবীকরণের যে চেষ্টা প্রাচীনকাল পেরিয়ে মধ্যযুগ অতিক্রম করার উৎসাহে পুষ্ট হতে শুরু করেছিল, তাকে বাস্তব সত্যরূপে প্রকাশোজ্জ্বল হতে দেখা যায় ভারতচন্দ্রের রচনায়।

'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'— ভারতচন্দ্রের এ প্রশ্ন ভক্তি-বিভোর গোটা মধ্যযুগকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে। জীবন-সচেতনতা সমাজের পুরনো জাতিধর্ম-ভেদের ছকটাকে যখন বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করে, ঠিক তখন থেকেই মানুষের সাধারণ জীবন একদিক থেকে শ্রেণী-সচেতন হয়ে ওঠার একটা পথ পায়। দীর্ঘ মধ্য-যুগে নতশির দেবভক্তির নেশা ছোটানো এই 'ভারত'-বাক্য বাংলা কাব্যে প্রথম জীবন-সচেতনতার শিলালিপি।

জীবনের বর্ধমান দাবির মুখে দাঁড়িয়ে সাধকের অধ্যাত্মবোধ ক্ষইতে ক্ষইতে ক্রমে কয়েকটা তুড়িমারা ভোজবাজির হাস্যকর অলৌকিকতা হয়ে দেখা দিয়েছিল, নাথ সাহিত্যে গোর্খবিজয়ের কাহিনীতে।

কদলীরাজ্য থেকে মীননাথকে উদ্ধার করতে শেষ পর্যন্ত গোর্খনাথ তুড়ি বাজিয়ে সব কদলীনারীকে বাতুড় করে উড়িয়ে দিলেন। অনায়াসেই বোঝা যাবে, এই হাস্যকর হঠযৌগিক প্রয়াস মানুষের প্রবল জীবনাগ্রহের মুখোমুখি কত তুচ্ছ। এ রচনায় মানুষের গণ-চেতনার স্ফুরণ নেই নিশ্চই, তবু গণচেতনা দেখা দেবার আগে মানুষের ভিতরে যে বাস্তবিক জীবন-চেতনা স্ফুরিত হতে দেখা যায়, তারই পট-ভূমি—আশ্রয়ী এই ভেল্‌কির ছবি দেখি গোর্খবিজয়ে।

পূর্ববঙ্গ গৈমনসিংহ গীতিকার কয়েকটি কাহিনীতে (মলুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী ইত্যাদি) গণচেতনা-প্রবুদ্ধ মানুষ নেই সত্য, কিন্তু যে মানুষ কালে কালে গণচেতনায় সংঘবদ্ধ হবে, তার সঠিক পূর্বাভাস মিলছে এই সব কাহিনীর কয়েকটি মূল নারী-পুরুষের কখনো প্রাণান্ত কখনো

ভেসে-যাওয়া জীবন-সংকল্পের ভিতরে। জীবন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত রুচি-মর্জির প্রবল টান এখানে দেশাচার-লোকাচারের প্রথাবদ্ধ গতানুগতিকতাকে উপেক্ষা করতে উদ্যত। মানুষের জীবনে 'ব্যক্তি' হয়ে ওঠার এই প্রথম প্রয়াস নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের গণমুখ জীবনবোধের উৎস।

প্রথাজীবনের বাইরে মুক্ত জীবন ভোগের দাবী অনেকটা গণ-চেতনার নিকট গোত্রের।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ক. রবীন্দ্রপূর্ব পর্ব (ঊনবিংশ শতাব্দী)

উনিশ শতকের কাব্যে গণজীবন-ভাবনা তেমন করে ফোটেনি। বদলে সচেতন স্বদেশবোধ এবং ব্যাকুল দেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের পরিক্রমা করে বিংশ শতাব্দীর বাঙলা কাব্যে গণজীবন অনুসন্ধান করতে সর্বপ্রথম 'রবীন্দ্র-যুগ'-প্রাধান্যের কথা আসবে। শিথিল চেতন বাঙালীর জীবনে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহকরূপে রামমোহন রায় জাতির মানস মুক্তির জন্য যে শ্রমদান করেছিলেন তারই ফলস্বরূপ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ সংস্কারকে দূরে রেখে বাঙালীরা ক্রমে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সচেতন।

উনবিংশ শতাব্দের এই সচেতনতার প্রথমার্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২—১৮৫৯) বাণী। তাঁর সাহিত্য সাধনা জুড়ে সমপ্রাণতাবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ব্যঙ্গবিদ্রূপের শাণিত অস্ত্র সাহিত্যকে যে কতখানি কল্যাণব্রতী করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত তৎকালীন সমাজ ও জীবন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর'—এ ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি লিখলেন:

"কিন্তু কি চমৎকার এই দুঃসময়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এতদ্দেশ হইতে রাশি রাশি নগদ টাকা জাহাজ পুরিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা এই সুবর্ণভূমি ভারতবর্ষের ধনদ্বারা নানা বিষয়েই স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্যবৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে আবার আমাদিগের স্বর্ণরৌপ্যাদি হরণ করণেরও সূত্রপাত করিলেন, অতএব ইংরেজদিগের ইংরাজী কৌশলে এই রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের সমূহ প্রকার দুঃখ হইবার সম্ভাবনা।" ১

সমকালীন সামাজিক অসমতা কবিচিত্তকে বিশুদ্ধ করায় নবজাগরণের স্পর্শ তাঁর সাহিত্যকে সংহত করতে পারেনি বলেই তাঁর সাহিত্য, সাহিত্য না থেকে সে যুগের তথ্যবহুল দলিল হয়েছে। সেই কারণে যুগ-সংকটের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচ্য সংস্কার ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পুরনো ও নতুন সাঁকোর সংযোগ রক্ষা করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মূলতঃ কবি। তবে সাংবাদিকতার নেশার আড়ালে তাঁর নানাবিধ রচনা সম্ভার অব্যাহত ভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে 'সংবাদ প্রভাকর' পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারীতে সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশ করেন এবং সেই পত্রিকা ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুনে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়াও তিনি

---

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সংবাদ প্রভাকর। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৪৮।

'সংবাদ রত্নাবলী' (১২৩৯), 'পাষণ্ড পীড়ন' (১৮৪৬) এবং 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭), নামে তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

বাঙালীর মনোসঙ্কটের যুগে গুপ্ত কবি উদাসীন থাকেননি বলেই তাঁর লেখনীতে চিত্ত চাঞ্চল্যের ছায়া দেখা যায়। কবিতা অকবিতার ভিড়ে দ্বন্দ্বসংকুল তাঁর রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সঠিক সমালোচনার ভাজন হয়েছিল।

"মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গভীর. উন্নত স্ফুটভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না; সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তিনি সদৃশ পটু ছিলেন না।" ১

অথবা

"তিনি এই বাঙলা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙলার গ্রাম্যদেশের কবি।" ২

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় শুচিতা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা সত্য কবি প্রাত্যহিক জীবনকে ক্লেদমুক্ত না করেই স্থূল ও লঘু পরিহাসের রসে সিক্ত কবিতা দিয়ে পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টাটা একটু বেশী করে গেছেন।

প্রসঙ্গতঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান মন্তব্য এস্থলে উল্লেখযোগ্য :

"কবি তাঁহার চারিপাশে যে সব মানুষ দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখিতে না পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন; এমন কি তাঁহার মনে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ অম্লান ছিল নিজের ব্যবহারে-আচরণে-কর্মেও সেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ তিনি দেখিতে পান নাই—

'স্বরূপ মানুষ কই এমন মানুষ কই / আমি ত মানুষ নিজে নই ॥"—৩

নীল আন্দোলন-এ বাঙালী চিত্তকে জাগিয়ে দিতে তিনি যেমন উৎসাহী ছিলেন তেমনি শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ব্যঙ্গের সুরটুকু না শুনিয়ে ছাড়েননি—

"মা তুমি কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু / শিখিনি শিং বাঁকানো / কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস। / যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা / গামলা ভাঙে না / আমরা ভুসি পেলেই খুশি হবো / ঘুসি খেলে বাঁচবো না।"

---

১ বঙ্কিম শত বার্ষিকী সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৮৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। বিবিধ খণ্ড

২ ঐ । ঐ । ঐ । ঐ

৩ তারাপদ মুখোপাধ্যায়। আধুনিক বাংলা কাব্য। পৃঃ ৩৭। মিত্র ও ঘোষ। ৫ম মুদ্রণ ১৩৭৪।

নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য সংলাপের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'-এ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে কবি লিখেছেন :

বোন, পোড়াদেশের কাণ্ড দেখে / ভেবে হলো বাই লো। / পাপ, মেয়ে জন্ম কেন হলো / ভাবি বসে তাই লো॥ সব, বড় ঘরের বড় কথা / বলতে নাহি পাই লো। / তাদের ঘরের বেলা নাফুর-নফুর / পরের বেলা ছাই লো॥ যত, নাদা পেটা বুদ্ধি মোটা / দলপতি চাঁই লো। / হায়, এরা হলো জেতের কত্তা / আইলো দিদি আই লো॥ / বোন, মূর্খ হয়ে এমন কোরে / বাঁচতে নাহি চাই লো। / ছি, মরতে গেলে নাহি মেলে / যমের বাড়ী ঠাঁই লো॥ / হলো, মেয়ে মুখো কত্তা মোদের / বুকের ছাতি নাই লো। / এমন ভাতারের ভাত আর খাবো না / দেশান্তরে যাই লো॥"

কবিতা গুণসম্পন্ন না হয়েও নারী শিক্ষার জন্য এমন পদ্য-পদ গুপ্ত কবির কলম থেকেই বের হতে পারে। অন্য দিকে ইংরেজ বিদ্বেষ এই কবিকে উত্যক্ত পদ্য লেখার ইন্ধন জোগায়।

"আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্ত্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে॥"

রুচিবিকার সর্বকালেই মানুষের ভ্রষ্টতার ফল। এই সংকীর্ণ গণ্ডী ভাঙবার সরল বিশ্বাসের আয়োজন তাঁর কবিতায়। বাঙলা দেশের মানুষের হৃদয়ে গুপ্ত কবি নিজের বিশিষ্ট স্থানটুকু করে নিয়েছিলেন। এ দেশের মানুষের দাস্য-সংকটের শরিক হতে পেরেছিলেন বলেই কবিকে জনগণের কবি বলতে লোভ হয়।

ইয়ং বেঙ্গল এবং ইংরাজী শিক্ষার মোহে স্বজাতি-বিস্মৃত যুবকদের উদ্দেশ্যে কবির খেদোক্তি শুনি :

॥ ক ॥

"সোনার বাঙাল করে কাঙাল ইয়ংবাঙাল যতজনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কানে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা॥
এরা না হিঁদু না মোসোলমান, ধর্মধনের ধার ধারে না।
... ...
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে আপন হাতে কেটে খানা॥

॥ খ ॥

যত কালের যুবো যেন সুবো / ইংরাজী কয় বাঁকা বাঁকা / ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো / ভিখারী কি অন্ন পাবে ॥ ... ... / হোয়ে হিঁদুর ছেলে টাঁসে চেলে / টেবিল পেতে খানা খাবে। / এরা বেদ কোরানের ভেদ মানে না / খেদ করে আর কে বোঝাবে ॥"

তথাপি গুপ্ত কবি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, শুধু ধর্মক্ষয়ের ভয়েই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সংবাদ প্রভাকর'-এর (২৭শে জুলাই ১৮৫৪) অংশটুকু স্মরণযোগ্য :

"এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার যে কল্পনা স্থির হইয়াছে তা অতি উত্তম ইংলণ্ডদেশে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে প্রকার বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে এ দেশীয় লোকে তাহার কোন বিষয়েই শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে ·· ··· এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অত্রস্থ প্রজাদিগকে তদপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিলে এতদিন তাহারা নানা বিষয়ে উপযুক্ত হইয়া উঠিত।" ১

প্রসঙ্গতঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য শোনা যাক :

"ঐতিহাসিক-বোধ ঈশ্বরচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বেকার শক্তিশালী কবি ভারত চন্দ্রের মধ্যেও বর্ত্তমান। ভারত চন্দ্রের মৃত্যুকাল ১৭৬০, পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে। কবির জীবৎকালের মধ্যেই বাঙালী তথা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষেত্রের একটি বিরাট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গেল, কেবল রাষ্ট্রক্ষেত্রেই নয়, বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রেও ইহার পূর্ব হইতেই পরিবর্ত্তনের ভাঙন শুরু হইয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের কোন তরঙ্গ ভারত চন্দ্রের কবিমনকে স্পর্শ করতে পারে নাই ; যে কবির সজীব কবি প্রতিভা আছে তাঁহার পক্ষে সমসাময়িক এই গুরুতর রাষ্ট্র ও সমাজ-বিপ্লবের উপর সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই সর্বপ্রথম কবি যাঁহার মধ্যে সমাজ-সচেতনতা ও ঐতিহাসিক-বোধ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ॥ ·· ····· ····· ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম বাঙালী কবি যিনি সমসাময়িক যুদ্ধগুলিকেও কাব্যের বিষয় করিয়া লইয়াছিলেন" ১

গুপ্ত কবির জীবনকাল অবধি (১৮১২ থেকে ১৮৫৯) বাঙলা তথা ভারতের সংকট কাল। কবি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পাতায় দেশবাসীকে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আহ্বান জানান। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ জুড়ে কবির যে দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী কালেই যুবচিত্ত জাগরণের কাজে তা যথেষ্ট সহায়ক হয়।

১ তারাপদ মুখোপাধ্যায়। আধুনিক বাংলা কাব্য। পৃঃ ৩১। মিত্র ও ঘোষ। ৫ম মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৭৪।

॥ ক ॥

"যৌবনের আগমনে জ্ঞানের প্রতিভাসনে / বস্তুবোধ হইল তোমার। / পুস্তক করিয়া পাঠ দেখিয়া ভবের নাট / হিতাহিত করিছ বিচার॥ / যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ গুণগীত / বৃদ্ধকালে গান কর মুখে। / মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা / তুমি তার সেবা কর সুখে॥" —(মাতৃভাষা)

॥ খ ॥

"এখন শুকায়ে দল ঝরিয়াছে সব। / নাহি গন্ধ মকরন্দ নাহি ভৃঙ্গ-রব॥ / জাগ জাগ জাগ সব ভারতকুমার। / আলস্যের বশ হয়ে ঘুমাও না আর॥ / তোল তোল তোল মুখ খোল রে লোচন। / জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন॥ / রাত্রি আর কিছু নাই হইয়াছে ভোর। / যে দেখিছ অন্ধকার-কুয়াশার ঘোর॥" / (ভারতের অবস্থা)

॥ গ ॥

"জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি / ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে? / তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত / মিছে কেন মর ভার বয়ে? / স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে ভারতের জরাদেহে / করিবেন শোণিত সঞ্চার।" / (ভারতের ভাগ্যবিপ্লব)

ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই 'নিধুবাবু' (১) আমাদের শুনিয়েছেন হৃদয়ের সংলাপ। তাঁর অভিজ্ঞতার জলন্ত উদাহরণ :

"বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কী আশা।
কত নদী সরোবর
কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা"

নিধুবাবুর স্বদেশপ্রীতি পরবর্তী কবিদের রচনা ধরে অগ্রসর হয়। অবশ্য এসবই গণচেতনার প্রসঙ্গ নয়। তবু কাব্যে গণচেতনা সঞ্চারিত হবার পূর্বে দেশ জুড়ে যে স্বদেশ ও স্বজাতি সচেতনতা জাগছিল, আলোচনার ক্ষেত্রে তার একটা ভূমিকা আছে।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ প্রীতি আবেগে, উচ্ছ্বাসে প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ' কবিতায়। এস্থলে উপলব্ধির গভীর পরিচয় দিয়ে গুপ্ত কবি বাঙলা সাহিত্য-অঙ্গনে দেশানুরাগের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য রাখেন :

---

(১) রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১—১৮৩৯)

"ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি
স্বর্গ-ভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাশধাম শিবপুর বটে নাম
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥"

অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের আলোচনা উদ্ধৃত ক'রে বলা যায়:
"ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের উৎসুক্য আজ ক্ষীণ হয়ে এলেও তাঁর কাব্যের থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন একাধিক সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল—এই তিন প্রধান সাহিত্যিক ছাড়াও আরও অনেক লেখকই সংবাদ প্রভাকরের আশ্রয়েই বাঙলা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন।" ১

মূলত: একালের কাব্যে গণমানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে পুরনো ভারতকে স্মরণে রেখেই। ফলে অখণ্ড চেতনা প্রাণবন্ত এবং প্রকাশমুখর হয় কালক্রমে।

ভাওয়ালের (অধুনা বাঙলা দেশ) কবি গোবিন্দ দাসের (১৮৫৫-১৯১৮) নির্বাসিত জীবনে দেশাত্মবোধ লক্ষ্য করা যায়। দারিদ্র্য, মর্মপীড়ন অনশন জনিত ঘটনাবলী তাঁকে পিষ্ট করেছে এবং কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। 'নববর্ষ'-কে লক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন:

"এস বর্ষ। অনিবার্য বিধির আদেশে / অবনত শিরে লই তোমার শাসন / এত দুঃখ, এত কষ্ট—আহি কত ক্লেশে / তথাপিও অশ্রুমুখে করি সম্ভাষণ।"

শোষণ এবং দুঃখশোকের জ্বালায় শাসক শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করতে ছাড়েননি:

"কত আর চক্ষু খেয়ে সে দৃশ্য দেখিব চেয়ে / কুক্কুর চিবাতে দিয়ে হৃদমর্ম স্থল? হা কি লজ্জা! হা কি ঘৃণা, বাঁচিয়া মরণ বিনা / বরাহের ভোগচিহ্নে অঙ্কিত কমল।"

অথবা

"দেও বর্ষ ভক্তি শিক্ষা জন্মভূমি প্রতি / ভাতৃভাবে সকলের কর সম্মিলিত / দ্বেষ হিংসা পরস্পর ঈর্ষা পাপ মতি / মনের মালিন্য যত কর প্রক্ষালিত।"

কবির ব্যক্তি-জীবনে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা, দারিদ্র্য, শোক-তাপ একীভূত হয়ে কবির আত্ম হননের পরিবেশ রচনা করে। কিন্তু কবির চিত্তবল এই ঘৃণ্য পাপ কর্মের গহ্বর থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। কবি তাই শুনিয়ে গেছেন:

---

১ ভবতোষ দত্ত। বাঙালির সাহিত্য। পৃ: ১২৫। ১ম প্রকাশ মহালয়া ১৩৮৪। ১২ই অক্টোবর ১৯৭৭। প্রকাশক শ্রীদ্বিজদাস কর। ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট। কলি-৯

"কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায় / কবে মানুষ মরে গেছে, বছর তিনেক প্রায়।"

কবির আন্তরিকতা তাঁকে এজন্য স্বতন্ত্র স্থান দান করেছে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে। গণজীবনের প্রতি কবির যে বেদনা, তার দরদ নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য।

"তোমরা বিচার কর তোমাদের দ্বারে / দরিদ্র ভাওয়ালবাসী / কাতরে কাঁদিছে আসি / পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে।"

অথবা

"নিষ্ঠুর সংসারে আহা কেহ কারো নয় / 'তুমি আমার আমি তোমার' মুখে শুধু কয়।"

অথবা

'ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক / সংসারে শত দুঃখ আসিবে আসুক "

অথবা

"তোরা কে কি নিবি আয় / আমি দিব ভালবাসা যে যত চায়।" ১

কবি গণজীবনের ভাষায় (প্রাদেশিক) সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর কবিতা। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল নিখাদ। নিজে দুঃখে পুড়ে যে বোধ লাভ করেছেন তা একার নয়। সমগোত্রীয় সকল শ্রেণীর। এই দিক থেকে তাঁর অকবিতাগুলোও সমাদরের যোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লেখক ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস ও কাব্য কাহিনী লিখতে উৎসাহিত হন। দেশপ্রীতিমূলক কাহিনীকাব্য 'সিরাজুদ্দৌলা', 'শিবাজীর অভ্যুত্থান', কিংবা 'প্রতাপাদিত্যের পুরুষকার', প্রভৃতি গণজীবনে স্বদেশ-চেতনার উদ্রেক করে।

আলোচ্য অংশে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'বঙ্গের বীরপুত্র'—(প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে কাহিনী কাব্য / ১৮৮৪); নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ (১৮৮৭); রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'কর্মদেবী' (রাজপুত চরিত্রের নিষ্ঠা এবং বীরত্ব বর্ণিত / ১৮৬২); শূর সুন্দরী (রাজপুত রমনীর বীরত্বের সঙ্গে সতীত্ব রক্ষার দৃষ্টান্ত / ১৮৬৮), 'পদ্মিনী' (আত্মসম্ভ্রম বোধে উজ্জ্বল রাজপুতানী / ১৮৫৮) প্রভৃতি দেশপ্রীতিপূর্ণ আখ্যায়িকা কাব্যগুলি শুধু ঐতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধিই করেনি কিংবা কবিত্বের স্ফুরণে দুর্লভ বস্তু হয়েই মাত্র ওঠেনি; সর্বাংশে সেগুলো দেশবাসীর নিষ্প্রভ প্রেমাবেগ স্ফুরিত করতে সাহায্য করেছে।

---

১ গোবিন্দ-চয়নিকা। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, সহকারী সম্পাদক, স্বভাব কবির পুত্র শ্রীমান্ হেমরঞ্জন দাস। ওরিয়েণ্টাল এজেন্সী।

নারীর সম্ভ্রম, কর্ত্তব্যের ডাকে অবিচল থেকে পরাজয় ও সাদরে মৃত্যুবরণের দীক্ষা, বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম বিষক্রিয়া কত ভয়ংকর হয়ে ওঠে জাতীয় জীবনে, সেই সব চিত্রাবলী নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক সত্যকে উপলব্ধি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে রস গ্রহণের সকল বন্দোবস্ত সহজেই স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখে যে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, তা শুধু বিস্ময়ের উদ্রেকই করে না, জন মনে চৈতন্যের উন্মেষ ঘটায়। বাংলা সাহিত্যের এই বিবর্ত্তনের পথটি শুধু নতুনই নয়, মূর্ছিত চেতনাকে জাগাতে শেখায়। এখানে প্রভাময়ীদেবীর কথায় বলা যেতে পারে :

"দেশের পুরাতন গৌরব ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ইতিহাসের পটভূমিতে রোমান্সের বর্ণ-বিন্যাস দ্বারা অভিনব রসসৃষ্টি করাই এই সকল কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ..... এই কাব্যগুলির ভিতর দিয়া জাতীয় ইতিহাসের প্রতি মানুষের মর্যাদাবোধ জাগরিত হইল এবং স্বদেশপ্রীতির প্রেরণা স্ফুরিত হইতে লাগিল।" ১

প্রসঙ্গত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত এবং নবীনচন্দ্র সেনের দেশপ্রেম-মূলক কবিতাংশের আলোচনায় প্রবেশ করলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্কটে কম্পমান কালের প্রতিচ্ছবি। কবিরা সযত্নে তাঁদের ভাবনাকে স্বষ্ট কাব্যধারায় নিঃশেষিত করেছেন।

উনিশ শতকের শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বদেশ বোধে ও-তার প্রকাশে কিছু দ্বিধা কোথাও বা স্ববিরোধ ফুটেছিল। ১৮৫৮ সালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে লিখলেন :

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে / কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে / কে পরিবে পায়?' কাব্যের শেষ অধ্যায়ে মোঘল চিতোর অধিকার করলে কবি বলছেন : 'ভারতের ভাগ্য জোর দুঃখ বিভাবরী ভোর / ঘুমঘোর থাকিবে কি আর? / ইংরাজের কৃপাবলে মানস উদয়াচলে / জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার॥' এখানে ইংরাজের কৃপায় ভারতের ভাগ্যোদয়ের কথা। এদেশে ব্রিটিশ শাসন একশো বছর পার হওয়ার পর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য লেখা। এ লেখার ঠিক আগের বছরে শিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে গেছে। ইংরেজের শাসনে ভারতে স্বাধীনতাহীনতার ক্ষোভ মুসলমান শাসনের পটভূমিতে জনান্তিকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন কবি। কিন্তু রচনার শেষাংশে ইংরেজ শাসকের প্রশংসা গেয়ে গোটা কাব্যখানার বিষয়বস্তুটাই তিনি বানচাল করে দিলেন। পদ্মিনী উপাখ্যানের বক্তব্য শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তা হল—

---

১ বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য (১৮৫০-১৯০০)। প্রভাময়ী দেবী। পৃঃ ১৬-১৭। কলি-বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৮

ভারতবাসীর পক্ষে মোঘলের শাসন অমঙ্গলের আর ইংরেজদের শাসনেই তার মুক্তি। দেশের স্বকালের স্বাধীনতা-তৃষ্ণার কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র রাজপুত-মারাঠা ইতিহাসের ব-কলম (১৮৭৬) চালিয়েছিলেন। 'পলাশির যুদ্ধে' নবীনচন্দ্র ইতিহাসের সেই ব-কলম বাতিল করে দেশের তৎকালীন পরাধীনতা সতর্কভাবে প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে জুড়ে দিলেন ক্লাইভকে দেবী ব্রিটানিয়ার আশীর্বচন: ধর বৎস! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ / বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্য নিদর্শন। / ..... যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি / হতভাগ্য বঙ্গবাসী-চিরপরাধীন / লয়েছে আশ্রয় তব, (দ্বিতীয় সর্গ)।

নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যখানি পরাধীনতার তীব্র জ্বালার পূর্বাভাস সমৃদ্ধ করুণ পদধ্বনি। পঞ্চ-সর্গে বিভক্ত কাহিনী জুড়ে স্বদেশপ্রেমিক সিরাজের অনিবার্য পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আত্মবিনাশের নিশ্চয়তা জাগায়। ইংরেজ-ভারতবাসীর কর্মিস দ্বন্দ্বের মধ্যে ধ্বংসের বীজ সুকৌশলে নবাবের স্বপ্নকে পদদলিত করে। রাজভক্ত প্রজাদের নির্মম পরিহাস বুকে নিয়ে তাঁকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়। তবে ইংরেজ বেনিয়ারা তাঁর গভীর স্বদেশ প্রাণতার তুর্যনিনাদ উপেক্ষা করার দুর্দমনীয় শক্তি পেয়েছিল এই স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকদের কাছেই। সুতরাং এই কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত পাঁচালীতে সর্বস্বান্ত নবাবের স্বদেশ চেতনার পাশাপাশি উচ্চারিত হয় এক নির্মল অনুভব:

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত / ভিন্ন জাতি; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।"

(প্রথম সর্গ / মুরশিদাবাদ—জগৎ শেঠের মন্ত্রভবন)

কাব্যের সূচনায় অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিঙড়ে ইংরেজ বিদ্বেষের যে আভাস দেয়, তা ভাবালুতা বলে ভ্রম হতে পারে, তবে বিদেশীর প্রতি তৎপ্রসূত বিশ্বাস নিশ্চিতরূপে দেশাত্মবোধ এবং স্বদেশী বিধর্মীদের প্রতি বিশুদ্ধ হৃদয়াকর্ষণকে শাশ্বত করে তোলে। নবীনচন্দ্রের কবি-মনের প্রচ্ছন্ন দেশানুরাগ সহচরের ভূমিকা পালন করে স্বদেশপ্রেমী নবাবের অন্তরের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকে বিশিষ্টতা দান করে। প্রগতি নিষ্ঠার তীব্র অভিব্যক্তি তাই শব্দময়:

"দিল্লি মুরশিদাবাদ, হইবি এখন / যবনের গৌরবের সভাধিভবন।" (চতুর্থ সর্গ/যুদ্ধ)

নবাবকে সতর্ক করার নিছক কৌতূহল নয়, সুপরিকল্পিত উপায়েই শত্রুচক্র তাঁর মৃত্যুকে একান্ত অনুচরের হাত দিয়েই মসীলিপ্ত করে।

"সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল / পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন। / নিবিল গৃহের দীপ; নিবিল তখন / ভারতের শেষ আশা, হইল স্বপন।"

(পঞ্চম সর্গ / শেষ আশা)

ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীযুদ্ধ' কাব্যের সিরাজ সম্পর্কে বলেন :

"পরলোকগত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় নবীনচন্দ্রকে তথ্যবিকৃতির অপরাধে অপরাধী করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রমাণ করেছেন সিরাজ চরিত্র ছিল নানা দোষে কলঙ্কিত, তাঁর চরিত্র—অঙ্কণে নবীন চন্দ্র বিশেষ তথ্য বিকৃতি ঘটাননি, বরং অসংযত উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী সিরাজের পতনে তিনিই প্রথম সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জন করেন। সিরাজের পতনের পর আমরা মোহনলালের কণ্ঠে শুনতে পাই—'কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ!" ১

মধুসূদন দত্তই তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যে বয়ে আনেন প্রকৃত স্বদেশ প্রেমের জোয়ার। সেই সূত্রে মুখ্য চরিত্র মেঘনাদের রূপায়নে বিশুদ্ধ দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ কতটা প্রকাশিত তা দৃষ্টান্তের আশ্রয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রচলিত সংস্কার বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষায় মধুসূদন অভিজাতদের (রামপক্ষ) গৌরব প্রতিষ্ঠা না ঘটিয়ে ব্রাত্যের (রাবণ পক্ষ) মহিমা ঘোষণা করেন। এই বলিষ্ঠ প্রয়াস নবমানবতাবাদের ইঙ্গিতকে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে সত্য করে তোলে। কবি রূপকের মাধ্যমে কালের বুকে কঠিন আঘাত হানেন। সযত্ন সিদ্ধ মেঘনাদ চরিত্র প্রাণ প্রাবল্যে মুখর। রাবণ চরিত্রেও অনুরূপ শৌর্য, বীর্যের পরিচয় প্রথম থেকে তৃতীয় সর্গ জুড়ে রয়েছে। কবি তাঁর প্রিয় পাত্রকে বধের জন্য আবেগ উচ্ছ্বাসে ব্যয় করেছেন ৭৫০ পংক্তি। এখানেই বুঝি সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে কবি তাঁর সকল প্রয়াস নিবদ্ধ করেছেন।

ঠাকুরবাড়ির ঐকান্তিক চেষ্টায় নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' স্বদেশ ভাবনার পীঠভূমি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' গঠনের পরিকল্পনা থেকেই 'হিন্দুমেলা'-র প্রতিষ্ঠা। এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনকালে (১৮৬৮ সন) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক সংগীতটি পরিবেশিত হয় :

"মিলে সব ভারত সন্তান / একতান মনপ্রাণ /
গাও ভারতের যশোগান। / ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?

---

১ রঙ্গলাল রচনাবলী। ভূমিকা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল : স্বদেশপ্রেম ও ভারত চেনা, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী। সম্পাদক ডঃ শান্তি কুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি। পৃঃ একুশ-বাইশ। প্রথম প্রকাশ : ১লা আশ্বিন ১৩৮১। দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স। কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট। কলি—১২

তৎকালীন 'হিন্দুমেলা' দেশানুরাগের মুখ্য প্রস্রবন। জাতীয় সংগীত ভিন্ন এস্থলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অংশটুকু স্মরণযোগ্য :

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'—

অথবা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের :

"লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে'

মনে করিয়ে দেয় তাঁদের দেশপ্রেমের অভিপ্রায়কে। সংস্কার-বদ্ধ মনের জড়তা অতিক্রমের প্রবল প্রয়াস আদ্যোপান্ত বেগবান। মনোমোহন বসুও নিরতিশয় আবেগে মাত্র নয়, মনের ভাগিদেই আত্মপ্রসার লাভের আশায় রীতি বিরুদ্ধ কথার ভিড়েও তথ্যাদি সমৃদ্ধ সংগীত সৃষ্টিতে পিছিয়ে থাকেন নি। তাঁর সেই জীবনবোধ আংশিক বিরোধাভাসে ম্লান হলেও ১৮৭৪ সনে লেখা গানটি (পরাধীনতা) দেশবাসীর মনে ইতিহাস চেতনার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে :

"দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন! / অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ! / তাঁতি, কর্মকার করে হাহাকার / সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার / দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, / হলো দেশের কি দুর্দিন! / আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ / কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ? / ধর্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ— / বাকল, টেনা ডোর, কপীন! / ছুঁই সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে / দিয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে—/ প্রদীপটি জ্বালিতে ; খেতে শুতে যেতে/ কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

অবশ্য গীতিকার পৌরাণিক নাটকে (হরিশ্চন্দ্র / ১২৮১) দেশবাসীর আন্তর্জ্বালাকে শাশ্বত করতে গেছে ঐরূপ মনোভাবকে প্রত্যক্ষ করান।

প্রসঙ্গত : গোবিন্দচন্দ্র রায়ের জনপ্রিয় সংগীত (কতকাল পরে) স্বদেশ প্রীতির আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

"কতকাল পরে ভারত রে
দুখ সাগর সাঁতরি পার হবে?
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ-নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখত সমুদায় দিলে
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।"

পরিচিত ভারতকেই যেন কবি চাক্ষুষ করালেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন বাংলায় যাঁরা রাজনৈতিক চেতনাকে জাতীয় জীবনে ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসেন তন্মধ্যে জনজাগরণের কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সংগীত' (১৮৭০)-এ সেই পরিচয় পাওয়া যাবে :

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' বোধ করি ইতিহাস চেতনাকে সেই গভীর উপলব্ধির মাঝে প্রতিবিম্ব করে তোলে। ফলে স্বাদেশিকতার বৈপ্লবিক তরঙ্গাঘাত গণ-মনে এসে পৌঁছায়। দীর্ঘ জটিল সমস্যার সমাধানে সেই থেকে শুরু হয় উত্তরাধিকারীর যাত্রা।

মহামিলনের বাসনায় 'কংগ্রেস' অনাড়ম্বর ভাবে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বজনের আনুকূল্যে সুভাষচন্দ্র বসু 'কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট' হয়ে এলাহাবাদে 'আনন্দভবন' কংগ্রেসের প্রয়োজনে হস্তগত না হওয়ায়, কলকাতা কর্পোরেশনের সৌজন্যে চিত্তরঞ্জন (সেন্ট্রাল) অ্যাভিন্যুতে ১৯৩৮-র ২৪শে আগষ্ট তারিখে বাংলার বুকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া 'মহাজাতিসদন' নামে গণ-মন্দিরটি প্রবীন ও নবীনের কাছে ঐতিহাসিক সম্পদ।

এর একমাত্র উদ্দেশ্য পীড়িত দেশের লাঞ্ছনা মুক্তির জন্য যুবচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করা। মুক্ত জীবনের মন্ত্র আস্বাদনে এই মিলনক্ষেত্রটি নবযুগ উন্মোচন করে। আত্মোপলব্ধির প্রেরণা জনগণমনে প্রসার লাভ করুক, সেই শ্রদ্ধার দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ। এই কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে স্বদেশী সংগীত প্রস্তুত এবং প্রচার হতে থাকে। কলকাতায় প্রথম অধিবেশন (১৮৮৬) রবীন্দ্র সংগীত : 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'— গেয়ে উদ্বোধন করা হয়। তাই স্বদেশী সংগীতগুলো আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবদান। সহস্র কণ্ঠ যোগে এরূপ দেশমাতৃকার বন্দনা বাঙালী চিত্তকে সহজেই গতিমুখর করে তোলে।

— — —